Deba Prasad Das

আমার মা

মা, আমার মা, মা আমার গুরু। আমার চেতন-অবচেতন সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছেন আমার মা। আমি ভীষণভাবে বিশ্বাস করি যে, মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন , এ পৃথিবীতে আমার কোন অস্তিত্বই থাকতো না আজ। আমি দেখতে পেতাম না রূপে রসে গন্ধে ভরা সুন্দর এই পৃথিবীর মনোহরা রূপ। তাই , আমাকে আলোর এ পৃথিবীতে নিয়ে আসার সমস্ত কষ্ট ,সমস্ত কৃতিত্ব আমার মায়ের। ছেলেবেলায় সারাক্ষণ শুধু খেলাধূলো, ঘুড়ি ওড়ানো আর হৈ হৈ ক'রে দস্যিপনা ক'রে বেড়াতাম ব'লে বাড়ীতে সে সময় আমি খুব মার খেতাম। প্রায় প্রত্যেক দিনই আমি বাড়ীর কারো না কারো হাতে মার খেতামই। এমনকি বাড়ীর অন্য কেউ দোষ করলেও আমার দস্যিপনা স্বভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত দোষটা গিয়ে পড়ত আমার উপর। এবং অন্যের দোষের শাস্তিও নির্বিবাদে পেতে হত আমাকেই। কিন্তু এই মার খাওয়া -টাওয়া সব নিমিষের মধ্যেই আমি ভুলে যেতাম , যখন মা এসে আমাকে আদর করে কাছে ডেকে আমার মাথায় তাঁর স্নেহঝরা হাত বুলিয়ে দিতেন। আমার কান্না-টান্না সব বন্ধ হয়ে যেত , যখন দেখতাম মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা-ও আমার সাথে সাথে কাঁদছেন। মায়ের কান্না দেখে আমি আর কাঁদতে পারতাম না। ভাবতাম, এ পৃথিবীতে এমন একজন অন্তত আছেন , যিনি আমার দুঃখটা বুঝতে পারেন , আমাকে আদর করেন, আমার ব্যথায় সমব্যথী হ'ন। আমার প্রতি মায়ের সেই সমব্যথার জন্যই আমি আর কাঁদতে পারতাম না কখনো। সেদিন ,মায়ের স্নেহ-মন্ত্রে আমার কান্না , মধুর হাসিতে পরিণত হলেও , আজ যখন কোন নির্জন মুহূর্তে সেদিনের সেই দস্যি ছেলেটার প্রতি মমতাময়ী মায়ের অকৃত্রিম স্নেহের কথা ভাবি , যখন মায়ের আঁচলে মুখ লুকানো নিজের ভেজা চোখ দুটোর কথা ভাবি , আমার ভীষণ কান্না পেয়ে যায়। মায়ের অভাবটা ভীষণ ভাবে বুকে এসে বাজে। নিজের অজান্তেই তাঁর ভালোবাসায় । ভিজে ওঠে চোখ। জগতে মায়ের মত আপন আর কেউ নেই। কেউ না। ঐ যে " বিচার ছবিতে একটা গান গেয়েছিলাম , - " বন্ধু পেলাম , সাথী পেলাম ,অনেক তীর্থ ঘুরে এলাম , শেষে আমি এই জানলাম , তুমি যে মা সবচেয়ে আপন " , সেই গান আমার জন্য শুধুই

একটি গান মাত্র নয় , সেই গান একেবারে আমার হৃদয়ের কথা ,আমার একান্ত নিজের কথা।

ছেলেবেলায় খাওয়া-দাওয়ায় আমার খুব বায়না ছিল। বাড়ীতে মাছ-মাংস ভালমন্দ যা কিছু রান্না হোক না কেন ,আমার জন্য আলু, পটলের কিছু একটা থাকতেই হোত। তা না হলে সেদিন আমি ভাতই খেতাম না। আলু-পটল আমার এত প্রিয় ছিল। কিন্তু আমাদের বাড়ীর মূল কর্তৃত্ব তো ছিল আমার ঠাকুমার হাতে, আমি বায়না ধরলেই সারা বাড়ী মাতিয়ে শুরু হয়ে যেত ঠাকুমার চেঁচামেচি - খাবিনা ! কেন খাবিনা ! সবাই খাচ্ছে , তোকেও খেতে হবে। এতটুকু ছেলে , তার জেদ দেখ। এ না খেলে তুই আজ উপোসই থাক।" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মা ঠিক জানতেন যে তার এই জেদি ছেলে মানা , ঐ আলু - পটল ছাড়া সত্যিই আর কিছুই খাবে না , হয়তো উপোসই যাবে আজ। তখন মা-ই যা হোক আলু ভাজা বা পটল ভাজা কিছু একটা করে দিতেন আমাকে। আমি তো বলব যে, এই সব করে করে মা হয়তো আমাকে একটু আস্কারাই দিয়ে ফেলতেন তখন। হয়তো একটু দস্যি ছিলাম বলেই বা বেশী মার-টার খেতাম বলেই আমার প্রতি মায়ের একটু অন্যরকম দুর্বলতা ছিল। হয়তো সেই দুর্বলতার ফলশ্রুতিতেই মায়ের ব্যাপারে আমিও একটু বেশী মাত্রায় দুর্বল। আমার মা মহামায়া দেবী ছিলেন খুবই সাধারণ ঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও যে খুব বেশী করতে পেরেছিলেন এমন নয়। তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সাধারণত যতটুকু পড়াশোনা করতেন , তিনিও হয়তো ততটুকুই লেখাপড়া করেছিলেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা তেমনভাবে না করলেও মায়ের মানসিকতা ছিল অসম্ভব রকমের মডার্ন , আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে, ওরকম একটি সাধারণ ঘরে মানুষ হয়ে এবং আমাদের মতো ওরকম একটি প্রাচীনপন্থী বাড়ীর বৌ হ'য়ে উনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন এই রকম একটি সুন্দর যুক্তিনিষ্ঠ মন ! আমার মা ক'দিন আমাদের বাড়ীর চৌকাঠ পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে পা রেখেছিলেন , ভালো ক'রে ভাবলে হয়তো ঠিক বলে দেয়া যাবে। অথচ মলয়ালি মেয়ে সুলোচনা কুমারণ , যিনি বর্ত্তমানে আমার স্ত্রী, তাকে বিয়ে করা নিয়ে আমার বাবা-কাকারা যখন প্রচন্ড আপত্তি তুলেছিলেন , যখন আমাকে বম্বে ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার জন্য ভীষণ চাপ দিচ্ছিলেন, তখন সারা বাড়ীতে একটি মাত্র মানুষই সেদিন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন , আমার পক্ষ নিয়ে সারা বাড়ীর বিরুদ্ধে কাউন্টার লজিক দিয়েছিলেন , - তিনি আমার মা। মা আমায় কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন , - "তুই বড় হয়েছিস, ভালোমন্দ বিচার করার মতো সৎবুদ্ধি তোর হয়েছে। তুই যদি মনে করিস সুলোচনাকে বিয়ে করে তুই সুখী হবি , তুই বিয়ে কর। তোর বাবা-কাকারা তো ওকে বিয়ে করবে না , বিয়ে করবি তুই। তোর মন যদি ওকে বিয়ে করতে চায় , আমার আশীর্বাদ রইল, তুই সুলোচনাকে বিয়ে কর।" ভাবা, যায় আজ

থেকে প্রায় চল্লিশ- পয়তাল্লিশ বছর আগেকার কোন old fashioned family র কোন মা তথাকথিত অসবর্ণ বিয়েতে এভাবে ছেলেকে আশীর্বাদ করছেন ! বিশেষত সুলোচনার জীবনে এমন কোন ছোট্ট একটি অতীত ছিল , যে অতীতকে মেনে নিয়ে আজকের কোন আধুনিকা মা-ও তার ছেলেকে এত স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ করতে কুন্ঠিত হবেন। আমি তো বলব যে , আজকের তথাকথিত বহু প্রগতিবাদী নারীর চেয়েও আমার মা অনেক এগিয়ে ছিলেন আজ থেকে অন্ততঃ আশী বছর আগেও। ছেলেবেলাতে দেখতাম, আমি হয়তো কিছু একটা করতে চাচ্ছি বা কোথাও যেতে চাচ্ছি , অমনি বাড়ীর অন্য কেউ এসে যখন এক ধমকে আমাকে থামিয়ে দিতেন , তখনও মা এসে বাবা-কাকার বিরুদ্ধে counter logic দিতেন , -" কেন ওকে না বলছ ? ছেলেপুলেদের সবকিছুতেই 'না' বলতে নেই। তাতে ছেলেপুলেরা মনে মনে বিগড়ে যায়। একবার 'হ্যাঁ' বলেই দ্যাখো। দেখবে খারাপ হবে না। যদি ভুল করে , তখন না হয় আর সেটা করতে দিও না।" মা যে আমার কিরকম দারুণ আধুনিকমনস্ক ছিলেন, সেটা মাকে যারা দেখেন নি , তাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না। বললাম তো, সে যুগের পটভূমিতে এক আশ্চর্য মহিলা ছিলেন আমার মা।

মা আমার , বাড়ীর বাইরে খুব একটা যেতেন না বল্লেই চলে। গোণা গুণতি যে ক'দিন বাড়ীর বাইরে গেছেন, হয় কোন তীর্থ দর্শনে কিংবা থিয়েটার দেখতে। মা থিয়েটার দেখতে খুব ভালোবাসতেন, থিয়েটার বা তীর্থ দর্শন যেখানেই মা যেতেন, সব সময় মায়ের সাথে সাথে আমিও সে সব জায়গায় যেতাম। মা যেখানেই যেতেন , সব সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মা যখন বলতেন ," মানা ,আমায় ওমুক জায়গায় নিয়ে চলো।" গর্বে,খুশীতে আমার অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের সেই খুদে বীরপুরুষের মতো হয়ে যেত আর কি। আসলে তো আমাকেই নিয়ে যেতেন মা , কিন্তু আমি মনে মনে ভাবতাম আমিই যেন ঘোড়া ছুটিয়ে খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে নির্বিঘ্নে মাকে তীর্থে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। অর্থাৎ ডাকাত পড়লে বা কোন বিপদ হলে যেন হা রে রে রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের মধ্যে, উদ্ধার করে আনবো মাকে। আমার দস্যি প্রকৃতি এবং মায়ের সেই বাৎসল্য মিলেমিশে এমনটাই আমার মনে হ'ত তখন। কোনদিন মা হয়তো বল্লেন, " মানা, আজ আমায় তারকেশ্বর নিয়ে চল।" বলতাম -চলো। " আমি তো মায়ের ঐ আদেশটুকুর পথ চেয়ে এক পায়ে অপেক্ষাই ক'রে থাকতাম। মা বলতেই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লাম। মা গেছেন পূজো দিতে। কিন্তু আমার মনে হ'ত যেন বেশ ঘটা করে পিকনিক খেতে গেছি। এত লোকজন , দোকানপাট, হৈ-হুল্লোড়, খুব ভালো লাগতো আমার। মাকে বলতাম,-" তুমি পূজো টুজো দাও , আমি একটু এদিক-সেদিক ঘোরা ঘুরি করি। " মা পূজো দিতে মন্দিরে চলে যেতেন। আর আমি হৈ- চৈ করে বেশ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতাম। সে সব স্মৃতি

ভাবতে ভাবতে এখন এই এত বয়সেও মাঝে মাঝে ইল্যুশনের মধ্যে যেন মায়ের সাথে পথ চলতে থাকি সেই ছোট্ট আমিটি। নিমেষেই পেরিয়ে যাই যেন জীবনের ফেলে আসা ষাট- সত্তরটা বছর। মনে আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে গিয়ে মা আমায় চার আনা পয়সা হাতে দিয়ে বলেছিলেন,- " নে তোর যা খুশি মিস্টি -টিস্টি কিনে খা গিয়ে। আমি মন্দিরে যাচ্ছি।" তখনকার দিনে চার আনার তো অনেক মূল্য। একটা বড় রসগোল্লা পাওয়া যেত দু-পয়সায়। এত্ত বড় রসগোল্লা মাত্র দু-পয়সায়। আমি ছেলেবেলায় মিস্টি খেতে খুব ভালবাসতাম। তবে ঐ সন্দেশ-টন্দেশ নয়। রসগোল্লা, লেডিকিনি নয়তো বা ঐ রাবড়ী। খুব ভালবাসতাম খেতে। এমন অবস্থায় ঐ চার আনা পয়সা পেয়ে আমার তো মনে হচ্ছিল যেন পুরো ময়রার দোকানটাই কিনে খাই আর কি। ময়রার ওখানে গিয়ে গবাগব খেয়ে ফেল্লাম এত্ত বড় বড় আটখানা রসগোল্লা। ফল যা হ্বার তাই হ'ল। বাড়ী ফিরে ভাত আর খেতে পারি না। পেটে তো তখনও পেল্লাই সাইজের সেই আটখানা রসগোল্লা। ভাত খাবো কেমন করে! ব্যস, শুরু হয়ে গেল ঠাকুমার বকাবকি। সেদিনও মা -ই এসে ঠাকুমার চক্রব্যূহ থেকে আমায় উদ্ধার করেছিলেন। বল্লেন,- " একবেলা ভাত না খেলে তোর বিরাট কিছু ক্ষতি হবে না। তুই রসগোল্লা খেতে ভালবাসিস, সেইটে তো আজ তৃপ্তি করে খেয়েছিস।" এখন আমার বয়স হয়েছে। ভদ্রভাবে বাঁচবার মতো দু-পয়সা উপার্জনও হয়তো করছি,কিন্তু মায়ের দেয়া সেদিনের সেই চার আনায় কেনা রসগোল্লার স্বাদ জীবনে আর কোনদিনই খুঁজে পাইনি।

মা থিয়েটার দেখতে খুব ভালবাসতেন, কোথাও ভাল কোন প্লে হলেই উনি দেখতে যেতেন। " রঙমহল " তো আমাদের নিজেদেরই থিয়েটার ছিল। ওখানে তো আমাদের অবাধ গতি। শিবরাত্রি বা অন্যান্য ছুটি ছাটার দিনে রঙমহলে সারারাত ধরে পালা হ'ত। মা আমাকে সঙ্গে করে আগেভাগে গিয়ে বক্সে বসে থাকতেন। মা বসে বসে জর্দা দিয়ে বেশ পান খেতেন। শো শুরু হওয়ার আগে কাকা বা কেউ একজন এসে হয়তো খবর নিয়ে যেতেন। তারপর শুরু হয়ে যেত পালা। চলত সারারাত ধরে। তখনতো আর সবকিছু সেভাবে বুঝতে পারতাম না। মায়ের সাথে যাওয়া, মায়ের পার্শে বসে থাকা,ওগুলোই আমার খুব ভালো লাগতো। তবে ঐ বসে থাকতে থাকতেই বুঝে - না বুঝে আমিও পরের দিকে এক নম্বর থিয়েটার ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম।

বড় হয়ে আমি যখন কাকার সহকারী হিসেবে বম্বেতে কাজ করতে চলে যাই এবং ওখানে হিন্দী ছবিতে সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি গান গেয়েও যখন বেশ নামটাম হয়েছে আমার, তখন মা একদিন আমাকে ডেকে বল্লেন,- " হ্যাঁ রে, তুই কি বাংলা গান গাইবি না কোনদিন? বাঙ্গালীর ছেলে, বাংলা গান গাচ্ছিস না কেন?" আমি বল্লাম,- " মা,

আমারও তো বাংলা গান গাইতে মন ছটফট করছে। কিন্তু কলকাতায় আমাকে যে, কেউ গাইতেই ডাকে না। গাইব কেমন করে ! " আমি তখন মন থেকে মেনে নিয়েছিলাম যে , I am an outcast from Calcutta কোনদিন আমাকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানো হবে , আমি তখন ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু মা বল্লেন ,- " না , কেউ ডাকুক বা না ডাকুক , তুই নিজের থেকে বাংলা গান কর।" তখন থেকেই এই চিন্তাটা আমায় পেয়ে বসল যে , যেভাবেই হোক বাংলা গান আমাকে গাইতেই হবে। এর কিছুদিন পরেই ঘটে লতার সেই রেকর্ডিং মিস করার ঘটনা এবং আমিও রেকর্ড করি আমার জীবনের প্রথম বাংলা গান " কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল ....." । আমার তো মনে হয় যে, লতার রেকর্ডিং মিস করাটা একটা গৌণ ঘটনা মাত্র, যে ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল বস্তুত আমার মায়ের আত্মিক আশীর্বাদ। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি , বাংলা গানের জগতে আমার আসার পেছনে সমস্ত কৃতিত্ব আমার মায়ের। বাংলা গানের জগতে আমার জন্মদাত্রী আমার মা। সেকারণেই এখনো কোন গান গাইবার আগে আমি আমার মাকে স্মরণ করি। আমি বিশ্বাস করি যে,জগতে মায়ের চেয়ে বড় গুরু আর কেউ হতে পারে না। " পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ " আমার জীবনে ততটা অর্থবহ প্রশস্তি নয়, যতটা অর্থবহ সংস্কৃত সাহিত্যের সেই শাশ্বত মাতৃ বন্দনা , " পিতুর্বধিকামাতা গর্ভধারণ পোষনাৎ , অতো হি ত্রিষুলোকেষু নাস্তি মাতৃসম গুরু।"আমি যখন " সারা জীবনের গান " রেকর্ডটা করি , তখন রেকর্ডিং এর ঠিক আগের মুহূর্তে মাকে স্মরণ করতে গিয়ে হঠাৎ আমার মন হ'ল, রেকর্ডের শুরুতে এই স্তোত্রটা গাইব না কেন। গান তো লিখেছিল পুলক অর্থাৎ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে ডেকে বল্লাম যে গানের শুরুতে আমি এই মাতৃস্তোত্রটা গেয়ে দিচ্ছি। পুলক বল্ল ,- " না , মান্না দা , ওটা দেবেন না।.....গানের সাথে ওটা মানাবে না।" আমি বল্লাম , একেবারে শেষ মূহুর্তে এটা আমার মনে এসেছে , এটা আমি গাইবই। কেউ আমাকে থামাতে পারবে না। এবং গেয়েদিলাম। এই রেকর্ডটা যখন বের হয় , আমার মা তখন খুবই অসুস্থ। একেবারে শয্যাশায়ী। ঐ অবস্থাতেই তিনি আমার গাওয়া " সারা জীবনের গান" রেকর্ডটি শুনেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর খুব ভালো লাগছিল ,- " মা , মাগো মা , মাগো মা আমি এলাম তোমার কোলে " , " হাটি হাটি পা পা ", " আমি রাজী রাখো বাজী ", " এসো যৌবন এসো হে বন্ধু ... " ," তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান " পর পর সব গানগুলো। কিন্তু " মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় , মনে হয় , জীবনের কত কাজ হয়ে গেল সারা " গানটিতে এসেই হঠাৎ মা যেন কেমন ঝিমিয়ে গেলেন।তারপর সেই শেষ গানটা , যেখানে আছে , - " আমায় চিনতে কেন পারছ না মা, সবি ভুলে গেলে, আমি তোমার অবোধ ছেলে ....এসো তুমি হাত বাড়িয়ে , চলো আমায় সঙ্গে নিয়ে,যেখানে সব জন্ম , মৃত্যু হয় একাকার ....." সেই গান শুনে

Deba Prasad Das

সেই গান শুনে মায়ের সে কি রাগ ! আমাকে ডেকে বল্লেন , " তুই কেন গাইলি এ গান ? আমি এখনো বেঁচে আছি , তুই কেন গাইলি এ গান ? " বলতে বলতেই মায়ের সে কি কান্না । মাকে এভাবে কাঁদতে কোনদিন আমি দেখিনি । মায়ের এমন কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেলেছিলাম সেদিন ।